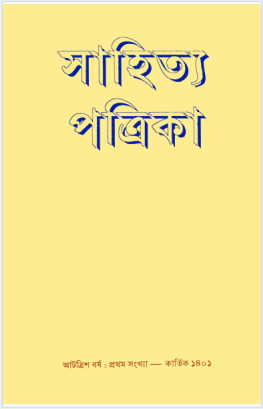

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা লোকসাহিত্য : শতাব্দীর সাধনা

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.2
Pages	27-39
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

বাংলা লোকসাহিত্য : শতাব্দীর সাধনা

ওয়াকিল আহমদ

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র প্রয়াসকে একত্র করলে লোকসাহিত্যের বিপুল সম্ভার পাওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য চৌদ্দ শতকের লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস বর্ণনা। এর মধ্যে দিয়ে এই শতকে লোকসমাজে বিরাজমান বাংলা লোকসাহিত্যের উপাদানসমূহের অবস্থান ও অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা যাবে।

বাংলা চৌদ্দ শতকে লোকসাহিত্য চর্চা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই উদ্যোগে আকৃষ্ট হয়ে এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরবর্তী সময়ে অনেকেই একাজে এগিয়ে এসেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পূর্ববঙ্গে এঁদেরকে অনুসরণ করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রমুখ।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বপর্যায়ে ফোকলোর চর্চায় প্রয়োগ করা হচ্ছে বহু তত্ত্ব। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চায়ও এর প্রভাব পড়েছে।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা লোকসাহিত্য বাংলার অক্ষরজ্ঞানহীন লোকসমাজের সৃষ্টি। কৃষি-প্রধান দেশের মানুষ অর্থনৈতিক কারণে গ্রামীণ জীবনযাপন করে, নগরজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে গ্রাম-নগরের ব্যবধান দীর্ঘকাল বিরাজ করেছে। ঠিক একই কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থেকেছে গ্রামের মানুষ ; শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার অপর প্রধান কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। বাংলার সমতলভূমির প্রকৃতি-পরিবেশ, আবহাওয়া, উৎপাদন-ব্যবস্থা বাংলার মানুষকে আবেগপ্রবণ করেছে। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য এরূপ সমাজ থেকেই উৎসারিত হয়েছে। বিশ্বের লোকসাহিত্যের সকল ধারাই বাংলা লোকসাহিত্যে বিকশিত হয়েছে। লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, গাথা, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি প্রধান শাখা নানা বৈচিত্র্য নিয়ে জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে। এক কথায়, বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার খুবই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ।

লোকসাহিত্যের অনুরূপ লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা এই লোকসমাজেরই ফসল। এগুলির কোনটি হস্তশিল্প (arts and crafts), কোনটি অঙ্গক্রিয়াশিল্প (performing arts)। লোকমানসজাত সব ধরনের উপাদানকে একত্রে 'ফোকলোর' (folklore) নামে অভিহিত করা যায়।

ফোকলোরের নানা সংজ্ঞা আছে। দু একটি সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করতে চাই, যা বর্তমান আলোচনায় সঙ্গতিপূর্ণ। আর. ভি. উইলিয়াম্‌স (R.V.Williams) বলেন: It (Folklore) is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.[Williams ১৯৯২:৪৪৮]। ফোকলোর এমন একটি অরণ্য-বৃক্ষ যার শিকড় অতীতের গভীরে প্রোথিত, যার শাখা-পল্লব-ফলাদি প্রতিনিয়তই বিকশিত ও প্রসারিত হয়। ফোকলোর নামক এই বৃক্ষটির শিকড় জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত থাকে আর জাতির প্রাণরস শোষণ করে ডাল-পালা-ফুলে-ফলে আত্মপ্রকাশ করে। অপর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন রুশীয় লোকবিজ্ঞানী ওয়াই. এম. সকোলভ (Y. M. Sokolov)। তিনি বলেন: "Folklore is an echo of the past, but the sametime it is also the vigorous voice of the present [Sokolov ১৯৫০:১৫]। ফোকলোর হল অতীতের প্রতিধ্বনি এবং একইসঙ্গে বর্তমানের প্রবল কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের অতীত ও বর্তমানের কথা ফোকলোরের নানা মাধ্যমে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। চার্লস ফ্রান্সিস পটার (Charles Francis Potter) বলেন: "Folklore is a lively fossil which refuses to die. [Potter 1949 : 40]"। ফোকলোর জাতির জীবন্ত ফসিল, তা মরে না, আবহমান ধারায় প্রবাহিত হয়ে বর্তমানকে স্পর্শ করে। এল. এ. হোয়াইট (L. A. White) বলেন, 'Folklore

is easily and readily transmited from one individual, one generation, one age, one people or one region to another by social mechanism'.

উপরের সংজ্ঞাগুলি দ্বারা আমরা বুঝাতে চেয়েছি যে ফোকলোর অতীতের বিষয় হয়েও সমকালের; এর ক্রমবিকাশ আছে, গতিশীলতা ও প্রবহমানতা আছে। কোনো এক শতাব্দীতে তা সীমাবদ্ধ থাকে না। যে অংশের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, সে অংশ স্মৃতি-শ্রুতিভ্রষ্ট ও বিশ্বাস-সংস্কারচ্যুত হয়ে লোপ পায়, আবার প্রয়োজনবোধে নতুন অংশের সংযোজন দ্বারা পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়। চৌদ্দ শতকের বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনার অর্থ এই নয় যে ঐ শতকে কি রচিত হয়েছে তার প্রকৃতি-পরিমাণ নির্ণয় করা এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। শিক্ষিত শ্রেণী লোকসাহিত্যের সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও আলোচনা-গবেষণা কে, কখন, কিভাবে করেছেন, আমাদের বর্তমান আলোচনা সেদিকে নিবদ্ধ থাকবে। আমাদের লক্ষ্য লোকসাহিত্যের চর্চার ইতিহাস বর্ণনা। এতে একটা বিষয় বেরিয়ে আসবে, এই শতকে লোকসমাজে বিরাজমান বাংলা লোকসাহিত্যের উপাদানসমূহের অবস্থান ও অস্তিত্ব। দুই বঙ্গের সমগ্র প্রয়াসকে একত্র করলে লোকসাহিত্যের বিপুল সম্ভার পাওয়া যায়। এ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে যে যাত্রা শুরু করেন; শতকের শেষে বহু জনের চর্চার দ্বারা তা বিপুলাকার ও বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। এই প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য হল এরূপ অনুশীলন-চর্চার একটি রূপরেখা নিরূপণ করা।[১]

পূর্বে সমাজের উপরতলার কিছু সংখ্যক মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা লেখা হলেও সাধারণ মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা একেবারেই লেখা হয়নি। আমাদের জ্ঞান ও চেতনার অভাবের কারণেই এরূপটি হয়েছে। উনিশ শতকে প্রশাসন, শিক্ষা, ধর্ম ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থেকে ইংরেজগণ বাংলার সাধারণ মানুষ, তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সমুলার, জেমস ওয়াইজ, ডালটন, টেইলার, হান্টার, উইলিয়াম জোনস, উইলিয়াম কেরী, জেমস লঙ প্রমুখ বিদ্বজ্জন প্রধান ছিলেন। উনিশ শতকে রাম রাম বসু থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক মনীষী ও বড় ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বাংলার ধর্ম, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে বলতে গেলে নীরব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশচেতনার ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথের *লোকসাহিত্য* (১৩১৪) প্রথম গ্রন্থ যাতে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে চারটি প্রবন্ধ আছে ; ১. ছেলেভুলানো ছড়া, ২. ছেলেভুলানো ছড়া-২, ৩. কবি-সংগীত ও ৪. গ্রাম্যসাহিত্য। প্রথম প্রবন্ধ *সাধনায়* ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* ১৩০১ মাঘ ও ১৩০২ কার্তিক সংখ্যায়, তৃতীয় প্রবন্ধ *সাধনায়* ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এবং চতুর্থ প্রবন্ধ *ভারতী*তে ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ চৌদ্দ শতকের শুরুতেই এমন একটি বিষয় এল যা হাজার বছর ধরে উপেক্ষিত হয়েছে। হাজার বছর ধরে হাজার হাজার মানুষ যে সম্পদটি গড়ে তুলেছে, শিক্ষিত সমাজ তার মূল্য দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভারই প্রয়োজন ছিল জাতির এরূপ 'গুপ্ত ধন' উদ্ধার করার জন্য। তিনি ছড়া ও গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনায় ৮১টি লৌকিক ছড়া সংকলিত হয়েছে; গানের আলোচনায় লোকসংগীতের উদ্ধৃতি আছে। তিনি উভয় ধারার ভাব ও ছন্দ সৌন্দর্য তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে ছড়া -গানের ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লোকসাহিত্যকে বাংলার আবহমান 'জনপদের হৃদয় কলরব' বলে মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ-আলোচনা করে ক্ষান্ত হননি, নিজের সৃষ্টিশীল কাজেও লৌকিক উপাদানকে ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে ও সংগীতে বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। ছড়ার ভাব ও ছন্দ, বাউল গানের ভাব ও সুর, রূপকথার ঘটনা ও চরিত্রকে উন্নত রচনার আঙ্গিকে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর সৃষ্টিতে লৌকিকতা বা গ্রামীণতা থাকল না, তাতে নতুন রূপ, রস, প্রাণ, আনন্দ ও সৌন্দর্য সৃজিত হল। তাঁর মতো বড় প্রতিভার দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান:

> দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদুষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে, প্রত্যক্ষ বাস্তবে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের সঙ্গে তাহাতে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৭:১৬]।

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান বৃথা যায়নি। তিনি যে গুপ্তধনের সন্ধান দেন, তার সংগ্রহ ও মূল্যায়নের কাজে অনেকেই এগিয়ে এলেন। প্রথম দিকে সংগ্রহ-আলোচনার ও প্রকাশনার কাজে সাময়িক পত্র-পত্রিকা দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে কলিকাতার *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লেখা মুদ্রিত

হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে আসেন দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, গুরুসদয় দত্ত, সতীশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, হরিদাস পালিত, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রমুখ প্রোথিতযশা ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের সাফল্য অনেক বেশী। তিনি মানিকগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১৯২৩) এবং *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৩ খণ্ড, ১৯২৬) তাঁর বড় কীর্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা লাভ করেন। কিশোরগঞ্জের সন্তান চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ কাজে তাঁকে সহায়তা দান করেন। 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা' হিসাবে এর সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ চলে ১৩২২-২৪ সনে। অসীম দরদ দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন এ-কাজটি সম্পন্ন করেন। বাংলার গ্রামীণ জীবন ও সমাজ তাঁর আবেগপ্রবণ মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গাথা-সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য ও রসসৌন্দর্য তুলে ধরেন। বাংলার মাটি-মানুষ-সমাজ-কৃষ্টির অনাবিল প্রাণস্পন্দনটি তাঁর আলোচনায় কল্লোলিত হয়েছে। তিনি লোকতত্ত্বের জটিল পথে যাননি, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে নান্দনিকবোধ ও সামাজিক চেতনার বিস্তৃতি এনেছেন। তিনি ময়মনসিংহের গাথাগুলিকে 'অনাবিষ্কৃত রত্নখানি' বলে উল্লেখ করেন এবং লোকাপবাদ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে সেসব সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে আলোর জগতে নিয়ে আসেন। তিনি অকপটে উচ্চারণ করেন:

> যদি বাঙ্গালার পল্লীগীতিকা, মনোহর সাঁই কীর্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, রায়বেশে নাচ, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার ভৌগোলিক তত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব ? বাঙ্গালাদেশ ত' তাহা হইলে লুপ্ত হইল [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৯৩ : ৮৫৯]।

দীনেশচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে কলকাতা থেকে চিত্তরঞ্জন দেব *বাংলার লোকগীত-কথা* (১৯৮৬) এবং ঢাকা থেকে বদিউজ্জামানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী *মোমেনশাহী গীতিকা* (১৯৭১) *সিলেট গীতিকা* (১৯৭২) ও *রংপুর গীতিকা* (১৯৭৭) প্রকাশ করে। আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলার লোকসাহিত্য* (১৯৫৭) ও আশরাফ সিদ্দিকী *লোকসাহিত্য* (১৯৬৩) গ্রন্থে আংশিকভাবে বাংলা গাথাসাহিত্যের উপর আলোকপাত করেন। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের *বাংলা গাথা কাব্য* এবং কৃষ্ণ সাধু খাঁর *বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যালাড বা*

গীতিকার প্রয়োগগত ও রূপরীতিগত বিশেষত্বের মূল্যায়ন (১৯৮৯, অপ্রকাশিত) এ ধারায় উল্লেখযোগ্য গবেষণা পুস্তক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক সুশীলকুমার দে *বাংলা প্রবাদ* (১৯৪৫) গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করে সাফল্য অর্জন করেন। এতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। সুশীলকুমার দের আলোচনা আবেগমুক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা প্রবাদের মূল্যায়ন করেছেন। তখন থেকে বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ-সংকলনের কাজ অব্যাহত ধারায় চলে এসেছে। ঢাকায় সংগ্রহের ও আলোচনায় বড় কাজ করেছেন মোহাম্মদ হানিফ পাঠান। তাঁর প্রণীত *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (২ খণ্ড, ১৯৭৬) গ্রন্থে ৮৮৪২টি প্রবাদ আছে। তিনি এগুলির অর্থ-প্রয়োগসহ সামাজিক-সাহিত্যিক তাৎপর্যও নির্ণয় করেছেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কিশোরদের জগৎ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা সংগ্রহ ও সম্পাদনা বাংলার শিশুদের স্বপ্নলোককে ভরে তুলেছিল। রাজপুত্র-রাজকন্যা, পক্ষীরাজ ঘোড়া-ময়ূরপংক্ষী নৌকা, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, লালকমল-নীলকমল, রাক্ষস-খোক্ষস, দেও-পরী, ভূত-প্রেত শিশুজগৎকে ছাড়িয়ে আমাদের সাহিত্যেও উঠে আসে এ-সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ ও অন্য অনেকে নানা উপমায়, অলংকারে, রূপকে, প্রতীকে এগুলির ব্যবহার করেছেন গদ্যে-পদ্যে। দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমার ঝুলি* (রূপকথা), *ঠাকুরদার ঝুলি* (রূপকথা), *ঠানদির থলে* (ব্রতকথা) এবং উপেন্দ্রকিশোরের *টুনটুনির বই* (উপকথা) আজও শিশুমনকে কল্পনায়, আবেগে, আনন্দে উদ্বেলিত ও রসসিক্ত করে চলেছে। উল্লেখযোগ্য যে,এসব রচনার সবই ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬২:৯৩]।

ফোকলোরের আন্তর্জাতিক গবেষণায় লোককাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সেগুলির প্রয়োগ করেছেন। অ্যান্টি আর্নের টাইপতত্ত্ব, থম্সনের মটিফ-ইনডেক্স, ভ্লাদিমির প্রপের ক্রিয়াশীলতা-মতবাদ লোককাহিনীর আলোচনা-গবেষণার দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হাফিজ এ-ধারার গবেষণা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের রচনায় এসব তত্ত্ব-মতবাদের কথা থাকলেও তাঁরা পূর্ণ প্রয়োগ করেননি। মযহারুল ইসলাম *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি* (কলিকাতা, ১৯৮২) গ্রন্থে ভ্লাদিমির প্রপের 'ক্রিয়াশীলতা-মতবাদ'কে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্য ও আশরাফ সিদ্দিকী সংকলন ও আলোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসাহিত্য* (৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬) এবং আশরাফ সিদ্দিকীর *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* (ঢাকা, ১৯৬৫), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের *ঢাকার লোককাহিনী* (ঢাকা, ১৯৬৫) ইত্যাদি গ্রন্থ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

বাংলার লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে সবচেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *হারামণি* (কলিকাতা ১৯৩১) দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্বে *হারামণির* ত্রয়োদশ খণ্ড (ঢাকা, ১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত *হারামণি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আশীর্বাদবাণী' ধারণ করে ধন্য হয়ে আছে। ২৮-১-৪১ তারিখের ঐ আশীর্বাদপত্রে তিনি লিখেন:

> মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন, আমি তার অভিনন্দন করি, ... স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে-তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করবে এই আশা করে [মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৯৪২]।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'পরিচয়' লিখে দেন:

> সমুদ্রোপকূলে বালুকারাশির মধ্যে যেমন অগণিত মনিমুক্তা ছড়ানো থাকে, বাংলার পল্লীজীবনে তেমনই বহু অমূল্য রত্ন বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। 'হারামণি' তাহারই সংগ্রহ [মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৯৪২]।

মনসুরউদ্দীন প্রথম অনুপ্রেরণা পান দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট থেকে; তিনি এবং জসিমউদ্‌দীন কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। জসিমউদ্‌দীন স্বয়ং পল্লীভাবাপন্ন কবি ছিলেন । তিনি পল্লীর ভাব-ভাষাকে আত্মস্থ করে কবিতা ও কাহিনীকাব্য রচনা করেন। তাঁরা উভয়ে 'দীনেশ স্কুল'-এর অনুসারী ছিলেন। খনির শ্রমিক যেমন অন্ধকার গুহা থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধনরত্ন সংগ্রহ করে, মনসুরউদ্দীন তেমনি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ও বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে *হারামণি* সংগ্রহ করেন এবং জহুরীর মত সেগুলির মূল্যায়ন করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। বিশেষত বাউল গানের সংগ্রহ, সূচী

নির্মাণ ও বিশ্লেষণ কাজে তিনিই তাঁর উপমা। এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যায়:

> বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যে সমস্ত মহারথী নানা ভাষায় স্ব স্ব জাতির মানুষের প্রাণের মধ্যে নিহিত রসবস্তু উদ্ধার করিয়া স্বজাতীয় গানের এবং বিশ্বমানবের সেবায় অতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গৌরবের অধিকারী হইয়া বাঙময় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, বাঙ্গালার মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।.... মনসুরউদ্দীন সাহেবের আট খণ্ডে প্রকাশিত এই 'হারামণি' সংকলনকে একখানি মহাগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে [বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬:২৮৮, ২৯১]।

বাউলগানের আলোচনায় ক্ষিতিমোহন সেন ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কৃতিত্বের অধিকারী। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলিকাতা, ১৩৬৪) গবেষণা-সফল রচনা। অন্যান্যদের মধ্যে ড. লুৎফর রহমান, ড. খন্দকার রেজাউল হক ও ড. আবুল আহসান চৌধুরী লালনসহ বাউল কবি, বাউল সম্প্রদায় ও বাউল গান সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

কবি জসিমউদ্‌দীন দুখানি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন– *জারীগান* (ঢাকা, ১৯৬৮) ও *মুর্শীদা গান* (ঢাকা, ১৯৭৭)। কবির এ-দানের তুলনা হয় না। সংগ্রহের কাজে কবির দরদ আছে, আলোচনায় আবেগ আছে।

গুরুসদয় দত্তের *পটুয়াসঙ্গীত* (কলিকাতা, ১৯৩৯) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাংলার ব্রত* (কলিকাতা, ১৩৫৪) বাংলা গানের দুটি স্বতন্ত্র ভুবনকে উদ্‌ঘাটিত ও আলোকিত করেছে। পটুয়া সঙ্গীত এখন অপসৃয়মান ধারা। গুরুসদয় দত্তের কালোপযোগী পদক্ষেপ সঙ্গীত ও চিত্র সম্বলিত একটি মিশ্রকলার নমুনাকে রক্ষা করেছে। গুরুসদয় দত্তের অপর অবদান 'ব্রতচারী'।[২]

গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিকের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত* (কলিকাতা, ১৯৬৬)। অঞ্চলভিত্তিক সংগ্রহ হিসাবে গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান। পরবর্তীকালে এ-ধারায় আর কেউ এগিয়ে আসেননি। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'মেয়েলী ব্রত' সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেন; তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকার* ৮টি খণ্ডে (কলিকাতা, ১৯৬৬-৬৮) প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণভাবে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও আলোচনায় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরে সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরীর নাম উচ্চারণ করতে হয়। তাঁর সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা, ১৯৭৩) গ্রন্থে বিচিত্র গানের

আলোচনা আছে। গান সংগ্রহ ও সংকলনে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলা একাডেমীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।[৩] বাংলা একাডেমী শুধু গান নয়, সমগ্র লোকসাহিত্যের ও লোকশিল্পের উপাদান সংগ্রহে ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সংকলন আকারে প্রায় ৫১-৫২ টি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। একাডেমীর ফোকলোর বিভাগ এ-দায়িত্ব পালন করে আসছে। সংগ্রহের তুলনায় গবেষণা পিছিয়ে আছে। আধুনিক যুগে ফোকলোর সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে, তার আলোকে এগুলি বিশ্লেষণ না করলে যাদুঘরে সংরক্ষিত নিষ্প্রাণ উপাদানে পরিণত হবে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর লোকসাহিত্যের সংগ্রহ-গবেষণা ঢাকা ও কলকাতা দুটি কেন্দ্রে প্রসারলাভ করে। বিভাগোত্তর লোকসাহিত্য মূলত গবেষণাকেন্দ্রিক। গবেষণার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের সন্তান আশুতোষ ভট্টাচার্যের দান সর্বাধিক। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত *বাংলার লোকসাহিত্য* লোকসাহিত্য বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ। তিনি সকল ধারাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতি নৃ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এটি তাঁর '*Magnum opus*' বা বৃহত্তম মহৎ রচনা। ষাটের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষাসূচীতে লোকসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরুণ ছাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। পরবর্তী সময়ে এঁরাই গবেষণায় এগিয়ে আসেন। শিক্ষায় ও গবেষণায় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য নেতৃত্ব দেন। ডঃ দুলাল চৌধুরী, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সনৎকুমার মিত্র, ড. শীলা বসাক 'আশুতোষ স্কুলে'র অনুসারী সফল গবেষক-লোকবিদ। তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন ; তাঁর ফোকলোর বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজীতে অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি ফোকলোরের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি* (কলিকাতা, ১৯৭২) উন্নতমানের গ্রন্থ। ইংরেজীতে Folklore পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা ফোকলোরকে সম্প্রসারিত করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-নাচের দল সংগঠিত করে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছৌ-নাচ প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিছুকাল আগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগ খোলা হয়েছে। তুষার চট্টোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ফোকলোরের পঠন-পাঠন ও গবেষণাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক লোকসাহিত্যের গবেষণায় নিবেদিত-প্রাণ। তাঁর প্রণীত *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা* (কলিকাতা, ১৯৭৯) এবং *বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা* (কলিকাতা, ১৯৮৮) দু'খানি উচ্চমানের গবেষণা গ্রন্থ। তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞানকে বাংলা লোকসাহিত্যের গবেষণায় সফলভাবে প্রয়োগ করেন। এর সঙ্গে নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকেও সংযুক্ত করেছেন। এতে তাঁর গবেষণা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে

হয়নি। আমার মতে, তিনি 'নির্মলেন্দু স্কুল' নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে এ-ধারার শ্রমসাধ্য ও বুদ্ধিধর্মী গবেষণায় এগিয়ে এলে বাংলা ফোকলোর উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবে। সনৎকুমার মিত্র ত্রৈমাসিক *লোকসংস্কৃতি গবেষণা* পত্র নিয়মিত প্রকাশ করে ফোকলোর চর্চায় অপর প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা যুক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নগরের প্রভাব কম পড়েছে ; এ-কারণে লোকসাহিত্যের চর্চা এতদঞ্চলে বেশী হয়েছে ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য কেবল পরিমাণে বেশী নয়, গুণেও উৎকৃষ্ট, প্রকরণে ও বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর।

চট্টগ্রামের সন্তান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও গবেষণায় একজন পথিকৃৎ ; তাঁর আলোচনাসমূহ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গবেষণা বেশি নেই, কিন্তু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আকারে যেটুকু আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও ঐতিহ্যবাহী। তিনি ইতিহাস-ভৌগোলিক পদ্ধতির গবেষণার প্রতি সফল অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত *Traditional Culture in East Pakistan* (ঢাকা, ১৯৬৩) অবশ্য গতানুগতিক ধারায় আলোচনা পুস্তক। ষাটের দশকে আশরাফ সিদ্দিকীর আবির্ভাব। তিনি লোকবিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় ফোকলোর অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেও তিনি লোকসাহিত্যের মূল্যায়নে সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অন্বেষণ করেছেন। তাঁর *লোকসাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৩) গ্রন্থে বাংলা লোকসাহিত্যেব প্রায় সব শাখার আলোচনা আছে। এটি পরে পরিবর্ধিত হয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর *Folkloric Bangladesh* (Dhaka, 1978) এ-ধারায় রচিত ইংরেজি গ্রন্থ। ফোকলোরের নানা শাখাকে স্পর্শ করে তিনি গবেষণাকে বিস্তৃতি দিয়েছেন সত্য, তবে অনেক স্থলে তাঁর Concentration-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ডক্টর মযহারুল ইসলাম লোককাহিনীর আলোচনায় বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত *ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা, ১৯৬৮) এ জাতীয় একখানি গবেষণা-গ্রন্থ। *History of Folktales Collections in India and Pakistan* (Dhaka, 1963) তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ। তাঁর অপর গ্রন্থ *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি* (কলিকাতা, ১৯৮২) নামেই প্রমাণ করে ভিন্ন মাত্রার বই। ভ্লাদিমির প্রপকে অনুসরণ করে তিনি প্রধানত লোককাহিনীর বিশ্লেষণে ক্রিয়াশীলতাতত্ত্ব (Function Theory) আরোপ করেছেন। তাঁর আলোচনায় অন্য অনেক তত্ত্বও উল্লিখিত হয়েছে। জটিল রীতির এই

গবেষণায় তিনি সফল হয়েছেন। নতুন গবেষক তাঁর আলোচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন।

আবদুল হাফিজ *লোককাহিনীর দিকদিগন্তে* (ঢাকা, ১৯৬৮) লোকসাহিত্যের আলোচনায় পাশ্চাত্যের মনীষীদের তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধারা প্রতিষ্ঠার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর নিজের কোন অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি ; অন্য কেউ অগ্রসর হয়ে আসেননি। আলমগীর জলীল, আলী নেওয়াজ, সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী, মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁদের সংগ্রহ ও আলোচনা বাংলা লোকসাহিত্যের চর্চাকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। উপজাতির লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় একক অবদান আবদুস সাত্তারের। তিনি শ্রম স্বীকার করে এ ধারার রচনা সংগ্রহ ও মূল্যায়ন না করলে ফোকলোরচর্চা অপূর্ণ থেকে যেত। তাঁর *আরণ্য জনপদে* (ঢাকা, ১৯৬৬) *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৭৮) প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ এবং *In the Sylvan Shadows* (Dhaka, 1970), *The Sowing of Seeds* (Dhaka, 1978) প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থ সুধিসমাজে আদৃত হয়েছে।

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনার্স, মাস্টার্স, এম ফিল, পিএইচডি পর্যায়ে পঠন-পাঠন-গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ফোকলোরের স্বীকৃতি জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ-ধারায় নতুন মেধা ও রক্ত সঞ্চার হচ্ছে না। একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। এখনও তা স্থাপিত হয়নি। একটি ফোকলোর পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ক্ষেত্রেও বর্তমানে শূন্যতা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগ খোলার দাবীও দীর্ঘদিনের। ফোকলোর বিষয়ক সমিতি-সোসাইটিরও অভাব আছে। এসব শূন্যতা দূরীভূত হলে ফোকলোর চর্চায় প্রাণ আসবে। আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি, কিন্তু সে-জ্ঞানকে প্রয়োগ করছি না। ফলে একটি বিশ্বজ্ঞান থেকে পিছিয়ে পড়ছি। নতুন গবেষক এগিয়ে এসে এ-দায়িত্ব তুলে নিবেন। পনের শতাব্দীর গবেষকগণের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

টীকা

১। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশে বাংলা সন ও খ্রিষ্টীয় সন চালু আছে। বাংলা চৌদ্দ শতকের শুরু খ্রিষ্টীয় ১৮৯৪ সনে ; সাত বছর পর খ্রিষ্টীয় বিশ শতক শুরু হয়। বাংলা চৌদ্দ ও খ্রীষ্টীয় বিশ শতকের মধ্যেকার এই ব্যবধান স্মরণে রেখে প্রবন্ধে সাল-শতাব্দীর উল্লেখ করেছি। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হয়;

তখন বঙ্গীয় ১৩৫৪ সন। আমরা সাতচল্লিশ, বায়ান্ন, একাত্তর সালকে যেভাবে ব্যবহার করি, এর সমতুল্য বাংলা সনের ব্যবহার করি না। আমাদের আলোচনায় খ্রিস্টীয় সনের বেশি উল্লেখ আছে।

২। স্বদেশী যুগে ব্রতচারী আন্দোলন তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর মূল ভিত্তি ছিল ব্রতের গান ও আচার। নাচ-গান-প্যারেড সমন্বয়ে গঠিত এই ব্রতাচারের মাধ্যমে স্কুল-পাঠশালায় ছেলেমেয়ে দেশপ্রেম, ঐতিহ্যচেতনা ও নীতিশিক্ষা লাভ করত। এটি দৈহিক গঠনেরও উত্তম মাধ্যম ছিল।

৩। লোকসঙ্গীত সংগ্রহের ও আলোচনার পাশাপাশি অপর একটি দিক বিকশিত হয়েছে, তা হল লোকসঙ্গীত-চর্চা। আর এ-ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব উত্তর বঙ্গের সন্তান আব্বাসউদ্দীন আহমদের। তাঁর অপূর্ব দরদ কণ্ঠের সুরেলা সারা বাংলার মানুষকে মোহিত করেছিল; তাঁর গানের বহু সংখ্যক রেকর্ড বের হয়েছিল। রেডিও ও সভাসমিতিতে গান গেয়ে তিনি শ্রোতাকে অনাস্বাদিতপূর্ব রসে ও আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলতেন। পরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মল চৌধুরী, আবদুল আলীম, নীনা হামিদ পল্লীসংগীত গেয়ে সুনাম অর্জন করেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস *লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম* (কলিকাতা, ১৩৮৫) নামক একখানি গ্রন্থে তাঁর সঙ্গীতসাধনা ও জ্ঞানের ফসল তুলে ধরেছেন। আব্বাসউদ্দীনের *আমার শিল্পী জীবনের কথা* (ঢাকা, ১৯৬৫) একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বাংলা লোকসঙ্গীত চর্চার সঙ্গে তাঁর শিল্পীসত্তার নিবিড় স্পর্শ আছে এই গ্রন্থে। বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগ-উত্তর বাংলায় আব্বাসউদ্দীন কণ্ঠসংগীতে এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬২ — *বাংলার লোকসাহিত্য,* ১মখণ্ড। কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৯৩ — *বৃহৎবঙ্গ।* কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ — *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস।* কলকাতা।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৯৪২ — *হারামণি।* কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৭　　*লোকসাহিত্য* । কলকাতা ।

Potter, Charles Francis
১৯৪৯　　'Folklore' in *Dictonary of Folklore, Mythology and Legend* (Ed. Maria Leach) । নিউইয়র্ক ।

Solokov, Y. M.
১৯৫০　　*Russian Folklore* । নিউইয়র্ক ।

White, L. A.　　*The Science of Culture.*

Williams. R. V
১৯৯২　　'Folklore' in *Encyolopedia Britanica* Chicago.